بسم الله الرحمن الرحيم

জুমুআর খুতবা (২ ডিসেম্বর ২০১১)

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)

বাংলা ডেস্ক নিজ দায়িত্বে খুতবার এই বঙ্গানুবাদ উপস্থাপন করছে।

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক যুক্তরাজ্যের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ২ ডিসেম্বর ২০১১-এর (২ ফাতাহ্, ১৩৯০ হিজরী শামসি) জুমুআর খুতবা।

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ (آمين)

মুসলমানদের মধ্যে মওলানা নামধারী এক শ্রেণীর আলেম আছে যাদের কাজই হচ্ছে ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করা এবং না জেনে না বুঝে আহমদীয়াতের বিরোধিতা করা। অনেক এমনও আছে ধর্মের সাথে যাদের কোন সম্পর্ক নেই আর এরা সংখ্যায় অনেক বেশি। তারা কেবল ঈদের নামায পড়ে আর বেশি হলে কখনো কখনো জুমুআর নামাযে চলে আসে। আবার এমন লোকও আছে যারা ধর্মের ব্যাপারে কোন প্রকার কঠোরতাকে পছন্দ করে না এবং মৌলভীদের তরফ থেকে যে কুফরি ফতওয়া আরোপ করা হয় তা অপছন্দ করা সত্ত্বেও ভয়ে মুখ খুলে না। আরো একটি শ্রেণী আছে, যারা ইসলাম বা ধর্মের বেশী জ্ঞান রাখে না ঠিকই কিন্তু ইসলাম বা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যদি অঙ্গুলী নির্দেশ করা হয় বা আপত্তি করা হয় তবে তার সদুত্তর দেয়া আবশ্যক জ্ঞান করে আর তাদের কোন ভাবে প্রতিহত করা ও তাদের মুখ বন্ধ করা উচিত বলে মনে করে। তারা চান, মুসলমানদের সকল ফিরকা সম্মিলিতভাবে ইসলামের শত্রুদের এবং দাজ্জালের কর্মকান্ড প্রতিহত করুক। এ দলে পাক-ভারতে বসবাসকারী মুসলমানরাও আছে, আরব বিশ্বের মুসলমানরাও আছেন এবং (পৃথিবীর) অন্যান্য দেশের মুসলমানরাও রয়েছেন। তাদের কথা হলো, তারা ইসলামকে কোন ফিরকার নামে নয় বরং শুধুমাত্র ইসলাম নামে দেখতে চায়। তাদের পক্ষ থেকে আহমদীয়া জামাতের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময় এই আপত্তি উত্থাপন করা হয়, ইসলাম ধর্মে দলাদলির কোন কমতি ছিল কি যে, আপনারা আর একটি নুতন ফিরকা বানালেন? তারা আমাদেরকে বলছেন, আপনাদের ভেতর ইসলামের প্রতি যদি সত্যিকার

সহানুভূতি থাকে তাহলে মুসলমানদেরকে ফিরকাবাজি বা দলাদলি থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করুন। সর্বপ্রথম আমি এমন প্রশ্নকারীদের ধন্যবাদ জানাব, কৃতজ্ঞতা জানাব কারণ তারা কমপক্ষে আমাদেরকে মুসলমানদের একটি ফিরকা মনে করেন, মুসলমান মনে করেন। না জেনে না বুঝে কুফরি ফতওয়া আরোপ করেন নি। এমন লোকদের কাছে আমি আবেদন জানাব, আল্লাহ্ তা'লা মুসলিম উম্মাহ্র প্রতি কৃপা প্রদর্শন করে মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-কে প্রতিশ্রুত মসীহ্ এবং মাহ্দীয়ে মওহুদ (যুগ মাহ্দী) করে এজন্য পাঠিয়েছেন যেন সকল ফিরকার পরিসমাপ্তি ঘটে। যেসব মুসলমানরা আহমদীয়া জামাতের অন্তর্ভূক্ত হয়ে, প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-কে হযরত নবীয়ে করীম (সা.)-এর সালাম পৌঁছাচ্ছেন তারা বিভিন্ন ইসলামী ফিরকার মধ্য হতে এসে স্ব-স্ব ফিরকাকে বিদায় জানিয়ে খাঁটি ইসলামের মূল শিক্ষার উপর আমল করার উদ্দেশ্যেই আহমদীয়া জামাতে অন্তর্ভূক্ত হচ্ছেন।

আল্লাহ্ তা'লা তাদের প্রতি অনুগ্রহ করে তাদের হৃদয় দুয়ার খুলে দিয়েছেন, তারা দলাদলি জলাঞ্জলি দিয়ে প্রকৃত ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তারা সেই ন্যায় বিচারক ও মিমাংসাকারীর হাতে দীক্ষা গ্রহণ করেছেন যাঁর সম্পর্কে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। তাঁর আবির্ভাবের মূল উদ্দেশ্য হলো, যেসব ভ্রান্ত কথা, শিক্ষা এবং বিদাত বিভিন্ন ফিরকায় অনুপ্রবেশ করেছে সে গুলোকে কুরআনের শিক্ষার আলোকে সংশোধন করা। সেগুলোকে যেন প্রকৃত কুরআনের শিক্ষার আলোকে গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়। আল্লাহ্ প্রেরিত সেই মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ইসলামী শিক্ষার আলোকে প্রদত্ত সুশিক্ষার কারণেই আহমদীয়া জামাত আল্লাহ্ ও রসূল (সা.)-এর নির্দেশ অনুসারে প্রত্যেক কলেমা পাঠকারীকে মুসলমান মনে করে। কোন মুসলমানের মুসলমান হওয়ার জন্য পবিত্র কলেমা **'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্'** পাঠ করাই যথেষ্ট আর হাদীস থেকেও এটিই প্রমাণিত। পক্ষান্তরে অন্য ফিরকাগুলোকে দেখুন! তাদের সবাই পরস্পরের বিরুদ্ধে কুফরি ফতোয়া প্রদান করে।

অতএব ইসলাম-দরদীদের এটি ভুল ধারণা যে, ইসলাম ধর্ম পূর্বেই এত ফিরকায় বিভক্ত, এর মধ্যে আহমদীয়া জামাত আবার একটি নুতন ফিরকা গঠন করে আরেকটি ফাসাদের ভিত্তি রেখেছে। এটি তাদের ভুল ধারণা আর কুরআন ও হাদীসের জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে এ ধারণা সৃষ্টি হয়েছে। যে কোন ফিরকার বই-পুস্তক পড়ে দেখুন! সেখানে পরস্পরের বিরুদ্ধে কুফরি ফতওয়ার বিশাল স্তুপ দেখতে পাবেন। আহমদীয়া জামাতের বই-পুস্তক যদি পড়েন তাহলে সেখানে ইসলামের ওপর বিধর্মীদের আক্রমনের খন্ডন দেখতে পাবেন বা মুসলমানদের কাছে এই আবেদন দেখবেন যে, কাফির ফতওয়া দেয়ার মত বিষাক্ত কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকুন আর ইসলামের সেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে যান অথবা এটি দেখবেন, আল্লাহ্র অধিকার এবং বান্দার প্রাপ্য অধিকার প্রদানের জন্য আমাদের কি করা উচিত। অথবা আমাদের এ বিষয়ের প্রতি তাগিদ দৃষ্টিগোচর হবে যে, পৃথিবীতে প্রেম-প্রীতি, ভালবাসা এবং আপোসের জন্য আমাদের কি করা উচিত আর ঘৃণার অঙ্গারকে নির্বাপিত করার জন্য আমাদের কি করা উচিত অথবা মহানবী (সা.)-এর সাহাবাগণের

পদমর্যাদা কি ছিল এ বিষয়টি তাতে দেখা যাবে। তাঁদের মধ্য থেকে প্রত্যেকেই উজ্জ্বল ও অনুকরণীয় নক্ষত্র ছিলেন। তাদের প্রত্যেকের স্ব স্ব মর্যাদা ছিল।

কাজেই আহমদীয়া জামাতের সাহিত্যে কুফরী ফতওয়ার পরিবর্তে এমন অনিন্দ সুন্দর কথা দৃষ্টি গোচর হয়। যেভাবে আমি বলেছি, (তাদের বই পুস্তকে) কুফরী ফতওয়ার স্তুপ দেখতে পাবেন। যেকোন ফিরকার ফতওয়ার বই নিয়ে দেখুন তাতে পরস্পরের বিরুদ্ধে এ সবই দেখতে পাবেন।

সাহাবাদের পদমর্যাদা সংক্রান্ত শেষ কথাটি আমি নিচ্ছি? যদি লক্ষ্য করেন তাহলে দেখবেন, ইসলামে প্রধান দল দু'টি হলো শিয়া ও সুন্নি। এরা আবার বিভিন্ন দল ও উপদলে বিভক্ত। এরা উভয়ে মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করে মহানবীর সেসব সাহাবী যারা প্রাথমিক যুগে অগণিত কুরবানী করেছেন তাঁদের মর্যাদাকে হেয় করতেও কোনরূপ কুণ্ঠা করেনি। বাড়াবাড়ির কারণে এরা একে অন্যের বিরুদ্ধে কুফরি ফতওয়াও দিয়েছে এবং দিয়ে যাচ্ছে। একপক্ষ যদি অতিরঞ্জন করে হযরত আলী এবং হযরত হোসাইন এর মর্যাদাকে অত্যাধিক বাড়িয়ে উপস্থাপন করে অন্য পক্ষ প্রথম সারির সাহাবাদের এবং খোলাফায়ে রাশেদীন এর মর্যাদাকে চরম নির্দয়ভাবে খাটো করার চেষ্টা করেছে, প্রত্যুত্তরে প্রথম পক্ষও সীমালঙ্ঘনে কোন প্রকার ত্রুটি করেনি। অতঃপর যেভাবে আমি বলেছি, এই বড় দলগুলোর অসংখ্য উপদল রয়েছে যা আরও একটি নৈরাজ্যের কারণ হয়ে আছে।

মনে হচ্ছে তাদের সকলের উদ্দেশ্য হচ্ছে ইসলামকে সহিংস, ফতওয়াবাজ আর বিশৃঙ্খলাবাদী ধর্ম সাব্যস্ত করা। কিন্তু যেমন আমি এখনই বর্ণনা করেছি, আহমদীয়া জামাতের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে, ইসলামের সৌন্দর্য ও অনিন্দ-সুন্দর চিত্র উপস্থাপন করা। এ কারণে আহমদীয়া জামাতকেও ঐসব দল এবং ফিরকার মত মনে করা— আহমদীয়া জামাতের প্রতি একটি অন্যায়। বর্তমানে আমরা মহররম মাস অতিক্রম করছি আর প্রত্যেক বছর আমরা এ মাস অতিক্রম করে থাকি। যেসব দেশে শিয়া ও সুন্নির সংখ্যা বেশি সেখানে মহররম মাসে উভয়ের পক্ষ থেকে জীবন এবং সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হতে দেখা যায়। পাকিস্তান হোক বা ইরাক অথবা অন্য কোন দেশ হোক সর্বত্র আমরা এটিই দেখে থাকি, মহররম মাসে কোন না কোন বিশৃঙ্খলা সংগঠিত হয়ে থাকে, জীবন এবং সম্পদের ক্ষতি সাধন করা হয়ে থাকে। যদিও এ ক্ষতি এখন প্রাত্যহিক বিষয় তথাপি মহররমে বিশেষ ভাবে বেশি হয়ে থাকে। যেভাবে আমি বলেছি, এরা একে অন্যের বিরুদ্ধে কুফরি ফতওয়ার স্তুপ সৃষ্টি করে রেখেছে এ বিষয়ের প্রতি যখন আমি দৃষ্টি দিলাম তখন অনেক তথ্য একত্রিত হয়ে গেছে। কিন্তু এতো বেহুদা ফতওয়া ও গালমন্দে তা ভরা যে, উদাহরণ স্বরূপও এখানে তা উপস্থাপনও করা যাবে না। আজ আমি কেবল এ যুগের ন্যায় বিচারক ও সত্যিকার মিমাংসাকারী প্রতিশ্রুত মসীহ্ এবং ইমাম মাহদীর প্রজ্ঞাপূর্ণ কতক উদ্ধৃতি যা তিনি (আ.) খোলাফায়ে রাশেদীন, সাহাবায়ে কেরাম এবং হযরত আলী ও ইমাম হোসাইন প্রমূখদের সম্বন্ধে বর্ণনা করেছেন তা উপস্থাপন করতে চাই। যাতে বুঝা যায় যে, কত সুন্দরভাবে তিনি (আ.) বিশৃঙ্খলার মূলকে নির্মূল করার চেষ্টা করেছেন। যখন আমি এ উদ্ধৃতিগুলো একত্রিত করিয়েছি তখন এগুলো শত শত পৃষ্ঠায় দাঁড়ায়। কিন্তু এখন সময়ের প্রতি লক্ষ্য

রেখে কেবল কয়েকটি (উদ্ধৃতি) আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন করছি। আহমদীয়া জামাতে বিভিন্ন ফিরকা থেকে আগত আহমদী সদস্যরা আছেন যাদের এখনও সঠিকভাবে তরবিয়ত হয়নি তাদেরও এসব উদ্ধৃতি শোনা আবশ্যক।

আমি আরো কিছু লোকের উদাহরণ দিয়ে ছিলাম যারা অনেক সময় এমটিএ দেখেন অথবা আমার খুতবা শুনেন আর এসব দেখে জামাতের প্রতি আকৃষ্ট হয় অথবা ইসলামের প্রতি সহানুভূতি রাখেন। এসব লোকদের মনে প্রশ্ন জাগে, আহমদীয়া মুসলিম জামাতও হয়তো অপরাপর ফিরকার মতই একটি ফিরকা। তাদের সামনে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উদ্ধৃতি তুলে ধরা আবশ্যক যেন তারা জানতে পারে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আসলে বিভিন্ন ফিরকাকে ঐকবদ্ধ করতে এবং সব ধরনের অতিরঞ্জন থেকে মুক্ত করতে এসেছেন।

আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মুসলমানদের ঐকবদ্ধ করার দায়িত্ব অর্পণ করে ইলহামের মাধ্যমে জানান, **'পৃথিবীতে বসবাসকারী সব মুসলমানদের একই ধর্মে একত্রিত কর'**। তাই তিনি এসেছেন সব মুসলমানদের এক হাতে ও এক ধর্মে ঐকবদ্ধ করার জন্য। আমি যেভাবে শুরুতে বলেছি, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কয়েকটি উদ্ধৃতি তুলে ধরবো। তাই প্রথমে আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এমন এক উদ্ধৃতি পাঠ করছি যেখানে খোলাফায়ে রাশেদীনদের পথে পরিচালিত হওয়াকে তিনি মু'মিন ও মুসলমান হওয়ার চিহ্ন বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি (আ.) বলেন, **'কোন ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত হযরত আবু বকর (রা.), ওমর (রা.), ওসমান (রা.) ও আলী (রা.)-এর রঙ ধারণ না করে ততক্ষণ পর্যন্ত সে মুসলমান বলে অভিহিত হতে পারে না'**। তাঁরা পৃথিবীকে ভালবাসতেন না বরং খোদার রাস্তায় নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে রেখেছিলেন। খোলাফায়ে রাশেদীনের পদমর্যাদা সম্পর্কে তিনি সিররুল খিলাফা পুস্তকের (বঙ্গানুবাদের-২১-২২) ৩২৮ পৃষ্ঠায় লিখেন, আরবী বই হবার কারণে আমি সকালে উদ্ধৃতিগুলো মূল বইয়ের পৃষ্ঠা নম্বরসহ আরবী অনুবাদকদের দিয়েছি যাতে অনুবাদ করতে সুবিধা হয়, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মূল বাক্যাবলী আরববাসীদের সামনে তুলে ধরা হলে তা বেশি প্রভাব সৃষ্টি করবে। কেননা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যে ভাষা ব্যবহার করেছেন তা অনুবাদক আরবী হলেও সেই মানে পৌঁছাতে পারবে না।

তিনি (আ.) বলেন **'খোদার কসম! তাঁরা এমন বীরপুরুষ যারা সর্বশ্রেষ্ঠ মানব মহানবী (সা.)-এর সাহায্যের জন্য মৃত্যুপুরীতে অবস্থান নিয়ে ছিলেন। তাঁরা খোদার খাতিরে নিজ পিতা, পিতামহ ও সন্তান-সন্ততিকে পরিত্যাগ করেছেন এবং ধারালো তরবারি দিয়ে তাদেরকে টুকরো টুকরো করেছেন এবং তারা প্রিয়জনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন এবং তাঁদের শিরোচ্ছেদ করেছেন। তাঁরা আল্লাহ্‌র খাতিরে নিজেদের ধন সম্পদ ও জীবন উৎসর্গ করা সত্ত্বেও স্বীয় কর্মকে তুচ্ছ মনে করে কাঁদতেন ও অনুশোচনা করতেন। বিশ্রামের জন্য আপন সত্তাকে সামান্য অধিকার প্রদান করা ছাড়া তাদের চোখ সুখনিদ্রা যাপনের জন্য কমই বন্ধ হতো আর তারা মোটেও আরাম প্রিয় ছিলেন না। তোমরা কীকরে একথা ভাবতে পারো যে, তাঁরা অত্যাচারী ও আত্মসাৎকারী ছিলেন, সুবিচার করতেন না বরং অত্যাচার নিস্পেষণ**

করতেন? তাঁরা যে কামনা-বাসনাকে পরিত্যাগ করে মহান আল্লাহ্‌র সন্নিধানে সেজদাবনত এবং আত্মবিলীন করে রেখে ছিলেন তা সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত'। (সিররুল খিলাফাহ্, বঙ্গানুবাদের পৃ:২১-২২)

অর্থাৎ খোলাফায়ে রাশেদীন নিজেদের সব কিছু হযরত নবী করীম (সা.)-এর জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছেন এবং তাঁরা আল্লাহ্‌তে বিলীন ছিলেন।

পুনরায় তিনি (আ.) হযরত আবু বকর (রা.) সম্পর্কে সিররুল খিলাফাহ্ পুস্তকের ৪৯ নাম্বার পৃষ্ঠায় লিখেন, **'তিনি (রা.) একজন পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞানী, নম্র স্বভাবের অধিকারী ও দয়ার্দ্র প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তিনি বিনয়ের সাথে ও দারিদ্রের বেশে জীবন অতিবাহিত করতেন। অতি ক্ষমাশীল, স্নেহশীল ও দয়ালু ছিলেন, তাঁর ললাটের জ্যোতি দেখেই তাঁকে চেনা যেতো। মুহাম্মদ মুস্তাফা (সা.)-এর সাথে তাঁর গভীর সম্পর্ক ছিল। সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টির আত্মার সাথে তাঁর আত্মা একাকার হয়ে গিয়েছিল। তাঁর আত্মা এমন জ্যোতিতে উদ্ভাসিত ছিল যা তাঁর নেতা আল্লাহ্‌র প্রেমাস্পদ মুহাম্মদ (সা.)-কে আচ্ছন্ন করেছিল। রসূলুল্লাহ্‌র জ্যোতির ঔজ্জ্বল্য ও তাঁর মহান কল্যাণ ধারায় তিনি নিজেকে বিলীন করেছিলেন। কুরআনের বুৎপত্তি অর্জন ও নবীনেতা ও মানবতার গর্ব মহানবী (সা.)-এর প্রতি ভালবাসার ক্ষেত্রে তিনি সকল মানুষের মাঝে স্বতন্ত্র ছিলেন। পারলৌকিক জীবনের স্বরূপ এবং ঐশী রহস্যাবলী যখন তাঁর সামনে স্পষ্ট হয়ে গেল, তখন তিনি ইহজাগতিক বন্ধন ছিন্ন ও দৈহিক সম্পর্ক পরিত্যাগ করে প্রেমাস্পদের রঙে রঙ্গীন হয়ে যান এবং শুধু একটি অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের খাতিরে নিজের সব চাওয়া-পাওয়াকে জলাঞ্জলি দেন। তাঁর প্রাণ জাগতিক কৌলুষ থেকে মুক্ত হয়ে এক সৎ ও অদ্বিতীয় সত্তার রঙে রঙ্গীন হয় আর বিশ্ব প্রভু-প্রতিপালকের সন্তুষ্টির সন্ধানে নিজেকে তিনি বিলীন করেন। সত্যিকারের ঐশী প্রেম যখন তাঁর সব শিরা-উপশিরা ও হৃদয়ের গভীরতম স্থানে এবং তাঁর রন্ধ্রে রন্ধ্রে স্থান করে নিল, তাঁর কথা-কাজ ওঠা-বসায় সে প্রেমের জ্যোতি যখন প্রকাশ পেতে লাগলো তখন তাঁকে 'সিদ্দীক' নাম দেয়া হলো'**। অর্থাৎ যখন তিনি মহানবী (সা.)-এর সত্তায় পূর্ণাঙ্গীনভাবে বিলীন হয়ে গেলেন তখন তিনি সিদ্দীক উপাধি পেলেন। এই হলো তাঁর মর্যাদা।

এরপর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) কেন ও কীভাবে এই পদমর্যাদা অর্জন করলেন তা স্পষ্ট করতে গিয়ে তিনি মোকামে সিদ্দীকিয়াত বা সিদ্দীক পদমর্যাদার বিস্তারিত চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, **'মহানবী (সা.) যখন হযরত আবু বকর (রা.)-কে সিদ্দীক উপাধি দিয়েছেন তখন আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন, তার মাঝে কী কী অনন্য বৈশিষ্ট্য বা পরাকাষ্ঠা বিদ্যমান ছিল। মহানবী (সা.) এ-ও বলেছেন, হযরত আবু বকর (রা.)-এর অন্তরের অন্তঃস্থলে বিদ্যমান গুণের কারণেই তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব। যদি গভীরভাবে লক্ষ্য করা হয় তাহলে দেখা যাবে, প্রকৃত পক্ষে হযরত আবু বকর (রা.) যে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা দেখিয়েছেন তাঁর দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া ভার। সত্য কথা হলো, প্রত্যেক যুগে যে-ই সিদ্দীকের গুণাবলী অর্জনের আকাঙ্খা করবে তার আবু বকরী বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি নিজের মাঝে সৃষ্টি করার লক্ষ্যে যতদূর সম্ভব চেষ্টা, সাধনা এবং এরপর যথাসাধ্য দোয়া করা আবশ্যক। যতক্ষণ পর্যন্ত আবু বকরীয় বৈশিষ্ট্যের ছাপ গ্রহণ না করবে এবং সেই রঙে রঙ্গীন না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত সিদ্দীকী পরাকাষ্ঠা অর্জিত হতে পারে না'**। তিনি (আ.) বলেন, আবু বকরীয়

প্রকৃতি কী? এখন এর উপর বিশদ আলোচনা এবং বর্ণনার সময় নয় কেননা এর বিস্তারিত আলোচনার জন্য দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। তিনি (আ.) বলেন, **'আমি সংক্ষিপ্তভাবে একটি ঘটনা বর্ণনা করে দিচ্ছি তাহলো, মহানবী (সা.) যখন নবুওয়তের দাবী করলেন তখন আবু বকর (রা.) বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে সিরিয়ায় গিয়েছিলেন। তিনি (রা.) যখন ফিরে আসছিলেন তখন পথিমধ্যেই এক ব্যক্তির সাথে তাঁর সাক্ষাত হলো, তিনি সেই ব্যক্তির কাছে মক্কার সার্বিক খবরা খবর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে বললেন, কোন নতুন খবর থাকলে শোনাও'।** নিয়ম হলো মানুষ যখন সফর থেকে ফিরে আসে আর পথে কোন স্বদেশী লোকের সাক্ষাত হয় তার কাছে স্বদেশের অবস্থা জানতে চায়। **'সেই ব্যক্তি উত্তরে বলল, নতুন খবর হলো, তোমার বন্ধু মুহাম্মদ (সা.) নবী হবার দাবী করেছে। তিনি শোনা মাত্রই বললেন, যদি তিনি (সা.) এ দাবী করে থাকেন তাহলে নিঃসন্দেহে তিনি সত্য। এই একটি ঘটনা দ্বারাই জানা যায় মহানবী (সা.)-এর সম্পর্কে তাঁর কত ভাল ধারণা ছিল। কোন নিদর্শনের প্রয়োজন পড়েনি। প্রকৃত কথা হলো, মোজেজা কেবল সে ব্যক্তিই চায় যে দাবীকারকের অবস্থা সম্পর্কে অনবহিত। যেখানে কোন সংকোচ বা দ্বিধা থাকে এবং অধিক জানার প্রয়োজন হয় সেখানে মোজেজার দরকার হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি দাবীকারকের অবস্থা সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান রাখে তার মোজেজার কী প্রয়োজন? মোটকথা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) মহানবী (সা.)-এর নবুওয়তের দাবী শোনামাত্রই ঈমান এনেছিলেন। এরপর মক্কায় পৌঁছে মহানবী (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি নবী হবার দাবী করেছেন? মহানবী (সা.) বললেন, হ্যাঁ তুমি ঠিকই শুনেছ। এতে হযরত আবু বকর (রা.) বললেন, আপনি সাক্ষী থাকুন! আমি আপনার প্রথম মুসাদ্দীক বা সত্যায়নকারী। তাঁর এমন বলা শুধু কথার কথা ছিল না বরং তিনি তাঁর কর্মের মাধ্যমে তা প্রমাণ করেছেন। আর তিনি মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তা পালন করে গেছেন এবং মৃত্যুর পরও তা তাঁর সাথে যুক্ত রয়েছে'।**

অতঃপর সেই বিশ্বস্ততা ও ত্যাগের বহিঃপ্রকাশ কীভাবে ঘটেছে। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বর্ণনা করেন, **'একদা কতিপয় শত্রু মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-কে একা পেয়ে তাঁর গলায় কাপড় জড়িয়ে তা পেঁচাতে আরম্ভ করে। এমনকি তিনি (সা.) প্রায় মৃত্যুর দ্বার প্রান্তে পৌঁছে যান। এমতাবস্থায় হঠাৎ আবু বকর (রা.) সেখানে উপস্থিত হন এবং তাঁকে (সা.) মুক্ত করেন। এ কারণে শত্রুরা আবু বকর (রা.)-কে বেদম প্রহার করে, তিনি অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে যান'।**

তারপর উম্মতের প্রতি হযরত আবু বকর (রা.)-এর অনেক বড় আরেকটি অনুগ্রহের উল্লেখ করতঃ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, 'অনুরূপভাবে হযরত আবু বকর (রা.)-র আয়াত **مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ** থেকে যুক্তি প্রদান করা সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে যে, তাঁর দৃষ্টিতে হযরত ঈসা (আ.) মৃত্যু বরণ করেছেন। যদি এই আয়াতের উদ্দেশ্য এটি হতো যে, পূর্ববর্তী নবীদের মধ্য থেকে কতিপয় নবী খাতামান্ নবীঈন (সা.)-এর যুগের পূর্বে ইন্তেকাল করেছেন আর কতক করেন নি তাহলে এ আয়াত প্রমাণ হিসাবে গ্রহণযোগ্যতা হারিয়ে ফেলবে। কেননা একটি অসম্পূর্ণ প্রমাণ যা সর্বব্যাপি নিয়ম হিসেবে কাজ করে না এবং অতীতের সবাইকে বৃত্তের ন্যায় পরিবেষ্টন করে না তা কোনভাবে

দলিল বা প্রমাণ আখ্যা পেতে পারে না। তাই হযরত আবু বকর (রা.)-এর বরাতে এই যুক্তি প্রদান করা বৃথা প্রমাণিত হয়। স্মরণ রাখার বিষয় হলো, হযরত আবু বকর (রা.) পূর্ববর্তী সকল নবী-রসূলের ইন্তেকালের ব্যাপারে যে প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন তা কোন সাহাবীই অস্বীকার করেন নি। অথচ তখন সকল সাহাবী উপস্থিত ছিলেন এবং সবাই শুনে নিরব থাকেন। এ থেকে প্রমাণ হয় এ বিষয়ে সাহাবাদের ইজমা হয়েছে। সাহাবাদের ইজমা একটি শক্তিশালী প্রমাণ আর তা মিথ্যা বা ভ্রষ্টতা সম্পর্কে হতে পারে না।

অতএব এ উম্মতের প্রতি হযরত আবু বকর (রা.) যেসব অনুগ্রহ করেছেন তার একটি হলো, ভবিষ্যতে যে ভ্রান্তি প্রকাশ পাওয়ার ছিল তা থেকে বাঁচার জন্য স্বীয় খিলাফতকালে সত্যের দ্বার খুলে দিয়েছেন এবং ভ্রষ্টতার বন্যার সামনে এরূপ এক বাঁধ বেঁধে দিয়েছেন যে, যদি এ যুগের মৌলভীদের সাথে সকল জিনেরাও যোগ দেয় তবুও এই বাঁধকে ভাঙ্গতে পারবে না। কাজেই আমরা দোয়া করছি, আল্লাহ্ তা'লা হযরত আবু বকর (রা.)-এর প্রতি সহস্র সহস্র আশিস বর্ষণ করুন। যিনি খোদার পক্ষ থেকে ইলহাম পেয়ে এ বিষয়ের মিমাংসা দিয়ে গেছেন যে, হযরত ঈসা (আ.) ইন্তেকাল করেছেন। আরো একটি নৈরাজ্য দূর করার ক্ষেত্রেও হযরত আবু বকর (রা.) মহান ভূমিকা রয়েছে। সে সম্পর্কে তিনি (আ.) বলেন,

'এমন মুহূর্তে হযরত আবু বকর (রা.) খলীফা হয়েছেন যখন মুসাইলামা অন্যায় ভাবে লোকদেরকে সমবেত করেছিলো। মানুষ হয়ত ধারণা করতে পারে, এরূপ পরিস্থিতিতে তাঁকে (রা.) কিরূপ কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হয়েছে। যদি তিনি দৃঢ়চিত্ত না হতেন এবং নবী করিম (সা.)-এর ঈমানের দৃঢ়তা তাঁর মাঝে না থাকতো তাহলে খুবই সমস্যা হত এবং তিনি ঘাবড়ে যেতেন। কিন্তু সিদ্দীক (রা.) মহানবী (সা.)-এর প্রতিচ্ছবি ছিলেন, অর্থাৎ তাঁর ছায়ার অধীনে ছিলেন আর তাঁর ছায়ায় জীবন কাটাতেন, তাঁর (সা.)-এর চরিত্রের ছাপ তার মাঝে ছিল এবং তার হৃদয় বিশ্বাসের আলোতে পরিপূর্ণ ছিল। এ কারণে তিনি সেই সাহসিকতা ও দৃঢ়তা প্রদর্শন করেছেন, মহানবী (সা.)-এর পর এর দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া ভার। তাঁর (রা.) জীবন ছিল ইসলামের জীবন। এটি এমন একটি বিষয় যে ব্যপারে দীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজন নেই। সেই যুগের অবস্থা জেনে নাও এবং এরপর হযরত আবু বকর (রা.) ইসলামের যে সেবা করেছেন সে সম্পর্কে ধারণা নাও। আমি সত্যিই বলছি, আবু বকর সিদ্দীক (রা.) ইসলামের জন্য দ্বিতীয় আদম ছিলেন। আমি দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে বলছি, যদি মহানবী (সা.)-এর পর আবু বকর না থাকতেন তাহলে ইসলামও থাকতো না। এটি আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর অনেক বড় অনুগ্রহ, তিনি দ্বিতীয় বার ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। স্বীয় ঈমানী শক্তির বলে সকল বিদ্রোহীকে শাস্তি দিয়েছেন এবং শান্তি প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা যেভাবে বলেছেন এবং অঙ্গীকার করেছেন, আমি সত্য খলীফার মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠা করব; এই ভবিষ্যদ্বাণী হযরত আবু বকরের খিলাফতের মাধ্যমে পূর্ণ হয়েছে। আর সর্গ-মর্ত্য ব্যবহারিকভাবে সেই সাক্ষ্য প্রদান করেছে। এটি হলো সিদ্দীকের সংজ্ঞা অর্থাৎ তাঁর মাঝে নিষ্ঠা ও পরাকাষ্ঠা এই মানের হওয়া চাই'।

অতঃপর হযরত ওমর (রা.)-এর রসূল প্রেম ও তাঁর নিষ্ঠা সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **'একবার হযরত ওমর (রা.) তাঁর (সা.) ঘরে গেলেন [অর্থাৎ হুযূর (সা.)-এর ঘরে গেলেন এবং দেখলেন] ঘরে কোন আসবাবপত্র নেই এবং হুযূর (সা.) একটি মাদুরে শায়িত আছেন এবং মাদুরের ছাপ হুযূর (সা.)-এর পিঠে দৃশ্যমান। এ অবস্থা দেখে হযরত ওমর (রা.) কেঁদে উঠেন। তিনি (সা.) বলেন, হে ওমর! তুমি কাঁদছো কেন? হযরত ওমর (রা.) বলেন, আপনার কষ্ট দেখে আমার কান্না এসে গেলো। পারস্য এবং রোমের অবিশ্বাসী বাদশাহ্‌রা বিলাসিতার মাঝে জীবন যাপন করছে আর আপনি এত কষ্টে জীবন কাটাচ্ছেন! তখন হুযূর (সা.) বলেন, এ পার্থিব জগতের সাথে আমার সম্পর্কই বা কি? আমার দৃষ্টান্ত প্রচন্ড উত্তাপে সফরকারী এক উষ্ট্রারোহীর যে দুপুরের প্রচন্ড তাপের সময় একটি উটে সফর করছিল। যখন প্রচন্ড তাপক্লিষ্ট ছিল তখন সে বাহনে উপবিষ্ট অবস্থায় সামান্য বিশ্রামের জন্য একটি গাছের ছায়ায় ক্ষণকালের জন্য যাত্রা বিরতি করে আর কয়েক মিনিট পর সেই উত্তপ্ত আবহাওয়ার ভেতর পুনরায় যাত্রা আরম্ভ করলো'।**

হযরত ওমর (রা.)-এর মর্যাদা সম্বন্ধে অপর এক জায়গায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **'সাহাবাদের মাঝে হযরত ওমর (রা.)-এর মর্যাদা যে কতটা উচ্চমার্গের তা জানো কি? অনেক সময় তাঁর (রা.) দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থনে কুরআন শরীফের আয়াত অবতীর্ণ হতো এবং তাঁর সম্পর্কে হাদীসে এসেছে, শয়তান ওমর (রা.)-এর ছায়া দেখে পালিয়ে যায়'**। অপর একটি হাদীসে এসেছে, **'আমার পর যদি কেউ নবী হতো তবে সে ওমর-ই হতো'**। আরও একটি হাদীসে এসেছে, **'পূর্বের উম্মতের মাঝেও মুহাদ্দিসগণ ছিলেন তবে এ উম্মতের মুহাদ্দিস হলেন ওমর (রা.)'**।

হযরত ওমর (রা.) সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আরও বলেন, **'কোন কোন সময় কোন ভবিষ্যদ্বাণী যা একবার-ই প্রকাশিত হবে বলে আশা করা হয় তা যদি ক্রমশঃ প্রকাশিত হতে থাকে অথবা কোন অন্য ব্যক্তির মাধ্যমে তা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় যেমন কিসরা (ইরানী সাম্রাজ্য) ও কায়সারের (রোমান সাম্রাজ্য) ধন-ভান্ডারের চাবি তাঁর (সা.) হাতে রাখা সম্পর্কিত আমাদের নবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী। অথচ এটি সুবিদিত বিষয় যে, এ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হবার পূর্বে মহানবী (সা.) মৃত্যু বরণ করেছিলেন, আর তিনি (সা.) না কিসরা ও কায়সারের ধন-ভান্ডার দেখেছেন আর না-ই এগুলোর চাবি দেখেছেন কিন্তু উক্ত চাবিসমূহ হযরত ওমর (রা.)'র লাভ করা অবধারিত ছিল; কেননা হযরত ওমর (রা.)-এর সত্তা প্রতিচ্ছায়া রূপে হযরত রসূলে করীম (সা.)-এর সত্তাই ছিল তাই ওহীর জগতে হযরত ওমর (রা.)-এর হাত মহানবী (সা.)-এর হাত বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে'**।

অপর এক জায়গায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **যতক্ষণ পর্যন্ত ইমামের কল্যাণে আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জিত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষ নিরাপদ নয়। ইসলামের সূচনাতে উক্ত বিষয়টির দৃষ্টান্ত দেখা যায়। ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে এক ব্যক্তি যে কুরআন করীমের কাতেব (লিপিকার) ছিলো, নবীজীর আধ্যাত্মিক জ্যোতির সান্নিধ্যের কারণে ইমাম অর্থাৎ মহানবী (সা.) যখন আয়াত লিখাতে চাইতেন অনেক সময় পবিত্র কুরআনের উক্ত আয়াত তার প্রতিও ইলহাম হতো। একদিন সে চিন্তা করল, আমার মাঝে আর রসূলুল্লাহ্**

(সা.)-এর মাঝে কীইবা পার্থক্য? কেননা আমার প্রতিও ইলহাম হয়! এরূপ ভ্রান্তির ফলে সে ধ্বংস হল এবং লেখা আছে যে, কবরও তাকে ছুঁড়ে বাইরে নিক্ষেপ করেছে'। মারা গেছে, দাফন করা হয়েছে এবং কবর তাকে বাইরে নিক্ষেপ করেছে যেভাবে বালাম বাউলকে ধ্বংস করা হয়েছিল। সে-ও তার পুণ্য এবং ওহীর কারণে এমন আত্মশ্লাঘার শিকার হয়েছিল। তিনি (আ.) বলেন, **'হযরত ওমর (রা.)-এর প্রতিও ইলহাম হতো। তিনি নিজ সত্তাকে কিছুই মনে করতেন না আর প্রকৃত নেতৃত্ব যা উর্ধ্বলোকের খোদা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তার অংশীদার হতে লালায়িত ছিলেন না বরং এক তুচ্ছ চাকর ও দাস হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন তাই খোদা তা'লার কৃপা তাঁকে ঐশী নেতৃত্বের নায়েব বা স্থলাভিষিক্ত করেছে। হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর মোকাবেলায় তিনি নিজেকে অতি নগন্য মনে করতেন আর তখন আল্লাহ্ তা'লা অনুগ্রহ ও আশিস বর্ষণ করে তাঁকে খলীফা অর্থাৎ নবীর খলীফা বানিয়েছেন'।**

অতঃপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সির্‌রুল খিলাফাহ্ পুস্তকের ৩২৬ পৃষ্ঠায় বলেন, **'আমার প্রভু আমার কাছে প্রকাশ করেছেন, হযরত আবু বকর সিদ্দীক, হযরত ওমর ও হযরত উসমান (রা.) শান্তিপ্রিয় এবং বিশ্বাসী-মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁরা এমন লোকদের অন্তর্ভুক্ত যাঁদেরকে আল্লাহ্ প্রাধান্য দিয়েছেন এবং রহমান খোদার বিশেষ অনুগ্রহের জন্য তাঁদেরকে বেছে নেয়া হয়েছে। তাঁদের প্রশংসনীয় গুণাবলী সম্পর্কে অনেক তত্ত্বজ্ঞানী স্বাক্ষ্য দিয়েছেন। মহামহিমান্বিত খোদার সন্তুষ্টির সন্ধানে তাঁরা স্বদেশ ত্যাগ করেছেন আর প্রতিটি রণক্ষেত্রের ভয়াবহতম স্থানে যুদ্ধ করেছেন। গ্রীস্মকালীন দুপুরের খর দাবদাহ বা শীতের রাতের তীব্র শীতের প্রতি তাঁরা ভ্রুক্ষেপ করেন নি বরং সদ্য যৌবনে উপনীত যুবকের প্রেমাসক্তির ন্যায় ধর্মপ্রেমে তাঁরা আবদ্ধ হয়েছেন। তাঁরা আপন-পর কারো প্রতি আকৃষ্ট হননি বরং বিশ্ব প্রভু-প্রতিপালক খোদার ভালবাসায় সবাইকে পরিত্যাগ করেছেন। তাঁদের কাজে এক প্রকার সুবাস এবং তাঁদের কর্মে বিভিন্ন ধরনের সৌরভ ছিল যা তাঁদের সুমহান মর্যাদা এবং তাঁদের বাগান-সদৃশ পুণ্যের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে যার প্রভাত সমীরণ নিজ সৌরভের মাধ্যমে তাঁদের অজানা অবস্থানের প্রতি দিক-নির্দেশ করে আর তাঁদের জ্যোতি স্বীয় ঔজ্জ্বল্যের মাধ্যমে আমাদের সামনে প্রতিভাত হয়। কাজেই তাঁদের পুণ্য যে আলো বিকিরণ করেছে তার ঔজ্জ্বল্যের নিরিখে তাঁদের সুমহান ধৈর্যের বিষয়ে সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হও'।**

পুনরায় তিনি (আ.) অপর এক স্থানে বলেন, **'এ বিশ্বাস আবশ্যকীয়, হযরত আবু বকর সিদ্দীক, হযরত ওমর ফারুক, হযরত যুনুরাইন অর্থাৎ হযরত উসমান এবং হযরত আলী (রা.) সকলেই প্রকৃত অর্থে ধর্মের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.) যিনি ইসলামের দ্বিতীয় আদম ছিলেন, একইভাবে হযরত ওমর ফারুক এবং হযরত উসমান (রা.) যদি ধর্মের প্রকৃত আমানতদার না হতেন তাহলে আজকে পবিত্র কুরআনের একটি আয়াতও আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে বলে আমাদের দাবী করতে অসুবিধা হতো'।**

অতঃপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সিররুল খিলাফাহ পুস্তকের ৩৫৮ পৃষ্ঠায় হযরত আলী (রা.)-এর মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেন, **'রহমান খোদার**

দৃষ্টিতে সবচেয়ে প্রিয় লোকদের মাঝে তিনি (রা.) ছিলেন একজন অতি বিশুদ্ধচিত্ত খোদাভীরু মানুষ, সর্বোৎকৃষ্ট বংশ ও যুগের নের্তৃস্থানীয় মানুষ, প্রবল শক্তিধর খোদার বিজয়ী সিংহ, স্নেহশীল খোদার বীর যুবক, দানশীল, পবিত্র হৃদয় এবং এমন অসাধারণ সাহসী যে গোটা শত্রুবাহিনী তাঁর মুখোমুখি হলেও রণাঙ্গণই হতো তাঁর অবস্থানের কেন্দ্রস্থল। তিনি সারাটা জীবন কষ্টদায়ক অবস্থার ভেতর কাটিয়েছেন। নিজ যুগে মানুষের জন্য নির্ধারিত তাক্বওয়ার উচ্চমার্গে তিনি উপনীত ছিলেন। খোদার পথে ধন-সম্পদ খরচ, মানুষের কষ্টলাঘব, এতীম-মিসকীন ও প্রতিবেশীদের দেখাশোনা করার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সর্বাগ্রে। যুদ্ধে তিনি বহুমুখী বীরত্ব প্রদর্শন করতেন। তীর ও তরবারী পরিচালনায় তিনি আশ্চর্যজনক দক্ষতা প্রদর্শন করতেন। একই সাথে তিনি ছিলেন সুমিষ্টভাষী ও বাগ্মী। তিনি তাঁর বক্তৃতা মানব হৃদয়ের গভীরে প্রবিষ্ট করিয়ে মনের মরিচা দূর করতেন। নিজ বক্তৃতার দিগন্তকে যুক্তির জ্যোতিতে তিনি আলোকিত করতেন। বিভিন্নমুখী কাজে তিনি ছিলেন অসাধারণ পারদর্শী। এসব বিষয়ে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ ব্যক্তিকে পরাজিতদের ন্যায় তাঁর কাছে ক্ষমা চাইতে হতো। সব কল্যাণময় কাজ, বক্তব্যের গভীরতা ও বাগ্মীতার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন উত্তম আদর্শ। যে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বকে অস্বীকার করে সে নির্লজ্জতার পথ অবলম্বন করে'।

এরপর সাহাবাদের (রা.) মর্যাদা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, 'দৃষ্টান্তস্বরূপ আমি সাহাবাদের অবস্থা উপস্থাপন করছি, তারা মহানবী (সা.)-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তাদের কাজের মাধ্যমে প্রমাণ করে দেখিয়েছেন, সেই অদৃশ্য খোদা যিনি পরম অদৃশ্য সত্তা মিথ্যা উপাস্যদের উপাসনাকারীদের দৃষ্টির বহু দূরে ও আড়ালে, তারা তাকে স্বচক্ষে, হ্যাঁ চাক্ষস দেখেছেন, হ্যাঁ প্রত্যক্ষভাবে দেখেছেন। নয়তো বলো, ব্যাপার কি যে তারা আদৌ ভ্রুক্ষেপ করেন নি বরং স্বজাতি পরিত্যাগ করেছেন, স্বদেশ ত্যাগ করেছেন, সহায় সম্পদ ত্যাগ করেছেন, বন্ধু ও আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন। তাঁদের কেবল খোদার উপর ভরসা ছিল। এক খোদার উপর নীর্ভর করে তাঁরা সেসব কাজ করে দেখিয়েছেন যে ইতিহাসের পাতায় দেখলে মানুষ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়। তাদের মাঝে কেবল ঈমান ছিল এবং তাঁরা কেবল ঈমানে সমৃদ্ধ ছিলেন। দুনিয়ার কীটদের ষড়যন্ত্র, পরিকল্পনা, পূর্ণ প্রস্তুতি ও প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও তাঁরা সফল হতে পারেনি। সংখ্যা, দল, সম্পদ সব কিছুই তাদের বেশি ছিল। কিন্তু ঈমান ছিল না এবং এটি না থাকার জন্যই তাঁদের ধ্বংস হতে হয় এবং সফলতা লাভে ব্যর্থ হতে হয়। কিন্তু সাহাবাগণ ঈমানের বলে সবকিছু জয় করেন। এক ব্যক্তি নিরক্ষর হিসেবে প্রতিপালিত হওয়া সত্ত্বেও নিজ সততা, বিশ্বস্ততা এবং ধার্মীকতার জন্য সুপরিচিত ছিলেন। তাঁরা যখন আহ্বান শোনলেন, আর যখন তিনি বললেন, আমি খোদা তা'লার পক্ষ থেকে এসেছি, এটি শোনা মাত্রই তারা তাঁর সঙ্গ বরণ করলেন এবং উম্মাদের মত তাঁর অনুগমন করলেন। আমি পুনরায় বলছি, কেবল একটি বিষয় তাঁদেরকে এ অবস্থায় নিয়ে গেছে, তা হচ্ছে ঈমান (বিশ্বাস)। স্মরণ রাখবে, খোদার উপর বিশ্বাস অনেক বড় বিষয়'।

মহানবী (সা.)-এর প্রতি গভীর ভালবাসার কারণেই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) খোলাফায়ে রাশেদীন, সাহাবাগণ বা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বংশধরদের সাথে তাঁর বিশেষ সম্পর্ক এবং ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। একে তিনি ঈমানের অঙ্গ জ্ঞান করতেন, যেভাবে আমি পূর্বেও বলেছি।

অন্যত্র তিনি (আ.) বলেন, **'আমাদের বিশ্বাস হচ্ছে, সব বুযুর্গ ও খোদাভীরুদের সম্মান করা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তা সবার স্ব-স্ব পদমর্যাদার নিরিখে হওয়া আবশ্যক। সম্মান করা আবশ্যক কিন্তু প্রত্যেকের স্ব-স্ব পদমর্যাদা রয়েছে, সে অনুযায়ী হওয়া চাই। সীমাতিক্রম করে নিজেই পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার মত অবস্থা যেন না হয়। এমন বাড়াবাড়ি করা উচিত নয় যার ফলে মহানবী (সা.) বা অন্য নবীদের অবমাননা হওয়ার আশঙ্কা থাকতে পারে। যে ব্যক্তি বলে, সকল নবী, এমনকি মহানবী (সা.)-ও ইমাম হোসাইনের সুপারিশে নাজাত বা মুক্তি পাবে, তারা এমন অতিরঞ্জন করেছে যারফলে সকল নবী এমনকি মহানবী (সা.)-এর ও অবমাননা হয়'।**

পুনরায় হযরত আলী ও হযরত হোসাইনের সাথে নিজের সামঞ্জস্যের কথা তুলে ধরতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, **'হযরত আলী এবং হোসাইনের সাথে আমার বিশেষ একটি সামঞ্জস্য আছে, যার রহস্য পূর্ব-পশ্চিমের প্রভু আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেউ জানে না। আমি তাকে শত্রু মনে করি যে তাঁদের প্রতি শত্রুতা রাখে। আর আমি অত্যাচারীদের অন্তর্ভূক্ত নই। আল্লাহ্ আমার সামনে যা প্রকাশ করেছেন তা আমি উপেক্ষা করতে পারি না। আর আমি সীমালংঘনকারীও নই'।**

এটিও 'সিররুল খিলাফাহ্'র একটি অংশের অনুবাদ। অতঃপর এ সামঞ্জস্যকে আরো সুস্পষ্ট করে তিনি (আ.) বলেন, **'ইসলামেও ইহুদী সদৃশ লোকেরা এ পথ অবলম্বন করেছে এবং নিজেদের ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে সব যুগে খোদার পবিত্র ও সম্মানিত লোকদের কষ্ট দিয়েছে। দেখো, কীভাবে হাজার হাজার নির্বোধ লোক ইমাম হোসাইন (রা.)-কে ছেড়ে এযিদের সাথে মিলিত হয়েছে এবং এ নিষ্পাপ ইমামকে হাত ও মুখের (ভাষার) মাধ্যমে কষ্ট দিয়েছে। অবশেষে হত্যা না করা পর্যন্ত ক্ষান্ত হয় নি। এরপর বিভিন্ন সময় এই উম্মতের ইমামগণ এবং মুত্তাকী এবং মুজাদ্দিদগণকে কষ্ট দিতে থাকে আর তাদেরকে কাফির, ধর্মহীন এবং যিন্দিক (এক ধরনের কাফির) নাম রাখতে আরম্ভ করে। হাজার হাজার সত্যবাদী তাদের হাতে নির্যাতিত হয়েছে। তাদের নাম যে কেবল কাফির রেখেছে তাই নয় বরং যতটুকু সম্ভব ছিল তাদেরকে হত্যা, লাঞ্ছিত এবং বন্দি করাতেও তারা পিছপা হয়নি। এখন আমাদের যুগ এসেছে, আর ত্রয়োদশ শতাব্দীতে লোকেরা সর্বত্রই এই বক্তৃতা করতো যে, চতুর্দশ শতাব্দীতে ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ মওউদ আসবেন; কমপক্ষে এই কথাতো বলতোই, একজন বড় মুজাদ্দিদের জন্ম হবে। কিন্তু যখন চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে সেই মুজাদ্দিদ আবির্ভূত হলেন আর খোদা তা'লার ইলহাম তাঁর নাম মসীহ্ মওউদ রেখেছে; কেবল খোদা তা'লার ইলহামেই তাঁর নাম মসীহ্ মওউদ রাখেননি বরং যুগে বিরাজমান নৈরাজ্য একথা বলছে যে, এর নিরসণকারীর নাম মসীহ্ মওউদ হওয়া উচিত, চরম ন্যাকারজনকভাবে তাঁকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করেছে আর তাঁকে সম্ভাব্য সকল**

কষ্ট দিয়েছেন। আর বিভিন্ন প্রকার ষড়যন্ত্র ও কুটকৌশলের মাধ্যমে তাঁকে লাঞ্ছিত এবং ধ্বংস করতে চেয়েছিল'।

মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, অপদস্ত ও ধ্বংস করার চেষ্টা করেছে। তিনি (আ.) অন্যত্র বলেন, **'আমি এই কাসীদায় (মসীহ্ মওউদ এর লিখা কাসীদা) ইমাম হোসাইন (রা.) সম্পর্কে অথবা হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে যা লিখেছি তা মানবীয় সাধ্যের ব্যাপার নয়। নোংরা সেই ব্যক্তি যে আত্মম্ভরিতার বশবর্তী হয়ে কামেল ও খোদাভীরুদের প্রতি কটুক্তি করে থাকে। আমি বিশ্বাস করি, কোন মানুষ হোসাইন (রা.) অথবা হযরত ঈসা (আ.)-এর মত খোদাভীরুদের প্রতি কটুক্তি করে এক রাত্রিও জীবিত থাকতে পারে না এবং মান আদালি ওয়ালিয়া সতর্কবাণী তাকে হাতে নাতে ধৃত করে। অতএব, কল্যাণমন্ডিত সে-ই যে স্বর্গীয় পরিকল্পনা বা ইচ্ছাকে বুঝে আর খোদার প্রজ্ঞাপূর্ণ পন্থা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে'।**

হাদীসে আছে **'মান আদালি ওয়ালিয়ান ফাকাদ আযানতুহু বিল হারবে'** অর্থাৎ যে আমার ওলীর (বন্ধু) সাথে বিরোধিতা করে আমি তার সাথে যুদ্ধের ঘোষণা করছি। তাই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **'যা কিছু আমি লিখে থাকি তা আল্লাহ্ তা'লার অনুমতি, ইচ্ছা ও নির্দেশে লিখি'।**

অতঃপর তিনি (আ.) আরেক স্থানে বলেন, **'মু'মিন তারাই হয়ে থাকেন যাদের কর্ম তাদের ঈমানের স্বাক্ষ্য দেয়। যাদের হৃদয়ে ঈমান বদ্ধমূল হয়ে যায় যারা নিজেদের খোদা এবং তাঁর সন্তুষ্টিকে সব বিষয়ের উপর প্রাধান্য দিয়ে থাকে। আর খোদাভীতির সুক্ষ্ম এবং সংকীর্ণ পথকে খোদার জন্য অবলম্বন করে আর তাঁর ভালবাসায় বিলীন হয়ে যায়। আর এমন সব বিষয় যা চারিত্রিক ব্যাধি অথবা অপকর্ম বা আলস্য অথবা শৈথিল্য এক কথায় প্রত্যেক বিষয় যা প্রতিমার ন্যায় খোদা থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায় তারা তা থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য এযিদের এই সৌভাগ্য লাভ কোনভাবে সম্ভব ছিল না। দুনিয়ার মোহ তাকে অন্ধ বানিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু হোসাইন (রা.) পূত-পবিত্র এবং নিঃসন্দেহে তিনি সেই সকল মনোনীতদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন এবং আছেন, যাদেরকে খোদা তা'লা স্ব-হস্তে পবিত্র করেন এবং নিজের ভালবাসায় প্রত্যাদ্দিষ্ট করেন। আর নিঃসন্দেহে তিনি বেহেশ্তের সর্দারদের একজন। আর তাঁর প্রতি এক অনু পরিমাণ বিদ্বেষ পোষণ করাও ঈমান নষ্ট হওয়ার কারণ হবে। আর এই ঈমামের খোদাভীতি এবং খোদার প্রতি ভালবাসা আর ধৈর্য এবং দৃঢ়তা এবং দুনিয়া বিমুখতা আমাদের জন্য উত্তম দৃষ্টান্ত। আর আমরা এই নিষ্পাপ ব্যক্তির হিদায়াতের অনুসরণকারী যা তিনি অর্জন করেছিলেন। ধ্বংস হয়ে গেছে সেই হৃদয় যে তাঁর শত্রু, আর সফল হয়েছে সেই হৃদয় যে কার্যতঃ তাঁর প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করে আর তাঁর ঈমান এবং তাঁর চরিত্র, বীরত্ব, খোদাভীতি, অবিচলতা এবং খোদাপ্রেমের সকল চিত্র প্রতিচ্ছায়া রূপে পরিপূর্ণ অনুসরণের সাথে নিজের অন্তরে সেভাবে ধারণ করে যেভাবে একটি পরিস্কার আয়নার মাঝে সুদর্শন মানুষের অবয়ব দেখা যায়। এ ধরনের মানুষ পৃথিবীর দৃষ্টির আড়ালে থাকে। এদের মূল্য তারাই বুঝেন যারা তাদের অন্তর্ভূক্ত। পৃথিবীর দৃষ্টি তাদের শনাক্ত করতে পারে না কারণ তারা পৃথিবী থেকে দূরে'।**

‘হযরত হোসাইন (রা.)-এর শাহাদাতের ঘটনার এটিই কারণ ছিল। কেননা তাঁকে শনাক্ত করা হয়নি। পৃথিবী কোন পবিত্র ও মনোনীতকে তার যুগে ভালবেসেছিল যে হোসাইনকে ভালবাসবে। বস্তুত হোসাইন (রা.)-এর অবমাননামূলক কাজ চরম দুর্ভাগ্য ও ঈমানহীনতার পরিচায়ক। যে ব্যক্তি হোসাইন (রা.) অথবা পবিত্র ইমামদের অন্তর্ভূক্ত কোন বুযূর্গের অবমাননা করে বা তার সম্পর্কে কোন অসম্মানজনক কথা উচ্চারণ করে সে তার নিজের ঈমানকে ধ্বংস করে কেননা মহাপরাপক্রমশালী আল্লাহ্ সেই ব্যক্তির শত্রু হয়ে যান যে তাঁর মনোনীত এবং প্রেমিকের প্রতি শত্রুতা রাখে’।

অতএব এ হলো সেই সুন্দর এবং ন্যায়নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা আর মুসলমানদের এক হাতে ঐকবদ্ধ করা আর দলাদলি নির্মূল করার শিক্ষা যা আল্লাহ্ তা’লার পক্ষ থেকে প্রেরিত এবং তাঁর প্রিয়জন আমাদেরকে দিয়েছেন। যিনি এই যুগে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রকৃত দাস হয়ে এবং শান্তি ও মিমাংসার বার্তা নিয়ে এসেছেন।

মুসলিম উম্মাহ্ এই বার্তাকে অনুধাবন করবে আর ফির্কাবাজী এবং বিশৃঙ্খলা ও একে অপরকে হত্যা থেকে বিরত থাকবে— খোদার কাছে আমার এই দোয়াই থাকবে। যেন ইসলাম এক নব মহিমায় পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে স্বীয় ঔজ্জ্বল্যে উদ্ভাসিত হবে।

এই মহররমের মাস সর্বত্র শান্তি এবং নিরাপত্তার মাঝে অতিবাহিত হবে এটিই আমার প্রত্যাশা। প্রত্যেক মুসলমান অন্য মুসলমানকে নিজের মুখ এবং হাত থেকে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদানকারী হবে এটিই প্রত্যাশা। মুসলমান দেশসমূহের সার্বিক অবস্থা এবং নৈরাজ্য থেকে মুক্তির জন্য অনেক বেশি দোয়া করুন। আজকাল অধিকাংশ দেশ খুবই খারাপ অবস্থার মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছে। আল্লাহ্ তা’লা প্রত্যেক দুস্কৃতকারীর অনিষ্ট থেকে ইসলাম এবং মুসলমানদেরকে নিরাপদ রাখুন।

অধিকাংশ মুসলমান দেশে অভ্যন্তরীণ কোন্দল এবং অশান্তি বিরাজ করছে যার জন্য সেখানে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে। আর এরফলে উন্নতির পরিবর্তে দ্রুত অবনতির দিকে যাচ্ছে। আর বিশ্বের সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থাও অস্থিরতার কারণ হিসেবে বিরাজ করছে। যেখানে পশ্চিমা বিশ্বে এর প্রভাব রয়েছে সেখানে প্রাচ্যের মুসলমান দেশ সহ অন্যান্য দেশ সমূহে এর প্রভাব রয়েছে। আরেক তৃতীয় ভয়াবহ পরিস্থিতির উদ্ভব হচ্ছে আর তাহলো, বাহ্যতঃ পৃথিবী খুব দ্রুত বিশ্ব যুদ্ধের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

আল্লাহ্ তা’লা বিশ্ব মানবতার প্রতি করুণা করুন, তাদেরকে বিবেক-বুদ্ধি দান করুন। আমাদেরকে এই দিনগুলোতে অধিকহারে দোয়া করা প্রয়োজন এবং সব ধরনের শতর্কতামূলক পরিকল্পনা হাতে নেয়া উচিত। আল্লাহ্ তা’লা আমাদের সাহায্য করুন।

(জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ ও বাংলা ডেস্কের যৌথ প্রচেষ্টায় অনূদিত)